Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 152–166
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস : প্রসঙ্গ 'সময়' ধারণা

সন্দীপ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : dassandip293@gmail.com

Keyword
ইতিহাস(history), সময় (time), বাচন (discourse), ক্রম(order), অবলোপন (elipsis), অতীতকথন (analepses), ভবিষ্যৎ কথন(prolepses), ব্যাপ্তিকাল (duration), বিরতি(pause), সারাংশ(summary), দৃশ্য (scene), পৌনঃপুনিকতা (frequency)

Abstract
বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুকুমার সেন বলেছিলেন, বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের পরেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ। পরবর্তী কালে বিজিত দত্ত তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে সুকুমার সেনের সিদ্ধান্তে শিলমোহর প্রদান করেন। কারণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলার কালানুক্রমিক (প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত) সময়পর্বকে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে বেশ কৃতকৌশলের দ্বারা উপস্থাপন করেছিলেন। সেক্ষেত্রে সমকালে (বিশ-শতক) তিনি সাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের পরেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাখালদাস বাংলার প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ নিয়ে লেখেন, 'পাষাণের কথা', 'হেমকণা' ও প্রায় ছ-শো বছরের গুপ্ত যুগ নিয়ে লেখেন, 'শশাঙ্ক', 'করুণা', 'ধ্রুবা', উপন্যাস তিনটি, অন্যদিকে পাল যুগের রাজা ধর্মপালকে নিয়ে 'ধর্মপাল' উপন্যাস ও মুসলমান বিজয়ের কাহিনি বিধৃত করেছিলেন তাঁর 'অসীম', 'লুৎফ-উল্লার'-র মত উপন্যাসে। উপন্যাস হল কথার শিল্প। কথক তাঁর সৃজিত আখ্যানে কথা দিয়ে বিশেষ একটি কালপর্বের সমাজ ব্যবস্থাকে (রাজনৈতিক-ভৌগলিক-আর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক) তুলে আনেন উপন্যাসের বাচনস্তরে। সেক্ষেত্রে উপন্যাসের বাচনস্তরে কাহিনিকাল নির্মিত হয় ঔপন্যাসিকের 'ফোকালাইজেশন' বা নিরীক্ষণের দ্বারা। যেহেতু কথা-আখ্যান মূলত স্থান-কাল-ঘটনা ও চরিত্রের (কনটেন্ট বা এক্সপ্রেশন) অবস্থার মিলিত প্রকাশ। প্রতিটি 'কনটেন্ট' কথকের নিরীক্ষণে পুনঃর্বিন্যস্তাকারে পুনঃনির্মিত হয় তাঁর আখ্যানের মাত্রায়ণে। অর্থাৎ, উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'কাল' বা 'সময়' একটি বিশেষ উপদান সে-কথা স্বীকার করে নেওয়া যায়। যে-কোনো উপন্যাসের কাহিনিই এই 'সময়' বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না। উপন্যাসের বাচন পরিসরে প্রকাশিত 'সময়' বিন্যাসই বলে দেয়, উপন্যাসের কাহিনিকাল। তারই ভিত্তিতে উক্ত প্রবন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির বাচন পরিসরে 'সময়' বিন্যাসের ধারণা আলোচনা করা হবে।

সেক্ষত্রে, সময়ের তিন উপাদন, ১. সময় ক্রম (Order) ২. কালের স্থায়িত্ব বা স্থিতিকতা (Duration) ৩. পৌনঃপুনিকতা (Frequency) -এর নিরিখে তুল্যমূল্যাকারে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হবে।

Discussion

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫, ১৩ এপ্রিল) একাধারে ছিলেন যেমন ঐতিহাসিক; তেমনি একজন ঔপন্যাসিক। তিনি বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় কুড়ি বছর ধরে (১৯০৫-১৯২৮) নিরলস সাহিত্যচর্চা করে অসংখ্য বাংলা প্রবন্ধ, গল্প, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হল,- 'পাষাণের কথা' (১৯১৪),'শশাঙ্ক' (১৯১৪), 'ধর্ম্মপাল' (১৯১৫), 'ময়ুখ' (১৯১৬), 'করুণা' (১৯১৭), 'ধ্রুবা' (১৯১৯), 'অসীম' (১৯২৪), 'লুৎফ-উল্লা' (পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি)। আমরা তাঁর উপন্যাসের বাচনে কাহিনি কিংবা ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে তিনি কিভাবে সময়কে ব্যাবহারে করছেন তাঁর একটি পাঠ নেবার চেষ্টা করব।

উপন্যাস যেহেতু কথা-আখ্যান বা 'Story with a storyteller' বা 'Speaker of the narrative words' সেহেতু আখ্যানে 'সময়' বিন্যাস অবধারিত ভাবে অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কথা-আখ্যানে মূলত দুই ধরনের সময় বা কাল আমরা লক্ষ্য করি। একটি অবধারিত ভাবে কথকের সময়কাল (discourse time), অর্থাৎ লেখক যে সময়ে বসে আখ্যান রচনা করছেন তাঁর সময় কাল। যেমন, রাখালদাসের সমস্ত উপন্যাসই বিশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে লেখা। অন্যদিকে 'story time' বা কাহিনিকাল। সেটা বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতেই পারে। কেউ সমকালের কাহিনি তাঁর আখ্যানের বাচনে তুলে আনতে পারেন, আবার কেউ কেউ হাজার বছরের পুরানো ইতিহাসকে তাঁর বাচনস্তরে কাহিনি হিসাবে দেখাতে পারেন। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনিকাল কথনকাল অপেক্ষা প্রাচীন, আবার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কাহিনিকালের পটভূমি বঙ্কিমের সমসাময়িক অর্থাৎ উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ। তবে দুটি ক্ষেত্রেই কথনকাল অপেক্ষা কাহিনিকাল হবে প্রাচীন ও পুনঃর্নির্মিত। রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনিকাল কথনকাল অপেক্ষা প্রাচীন ; তাই কাহিনি হয়ে উঠেছে সময়ের দাবিতে পুনঃর্নির্মিত ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সন্ধান করতেই রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাচনে 'সময়ে'-র ব্যবহার আলোচনায় প্রয়াস পেয়েছি উক্ত প্রবন্ধে।

১

'সময়'(time) হল এক রহস্যময় ধারণা ; যা নিয়ে প্রশ্নমুখরতা ও তাঁর উত্তর সন্ধান আজও বিরামহীন। এই রহস্যময় সময় ধারণাকে আখ্যানে কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে কথা-আখ্যানের সাংগঠনিক প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ করতে হলে, সময়ের তিন ধরণের ভূমিকার কথা স্মরণ করতে হয়। জ্যানেটের মতে সে-গুলি হল,-কাহিনির বাচনে সময়ের বিন্যাস বা order, ব্যাপ্তিকাল বা duration ও পৌনঃপুনিকতা বা frequency।

আখ্যান বাচনের সময় ধারণা 'প্রকৃত সময়' ধারণা থেকে একেবারই আলাদা। 'প্রকৃত সময়' ধারণা সর্বদা একমুখীক্রমে (অতীত-বর্তমান–ভবিষ্যৎ) বয়ে চলে, কিন্তু আখ্যানে তা হয় না। কারণ, আখ্যানে রয়েছে 'internal time sequence' বা অন্তর্গত সময় অনুক্রম। অর্থাৎ আখ্যানে উপস্থাপিত ঘটনার কোনটি আগে এবং কোনটি পরে ঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা। যদিও এই ধারণা একান্তই আখ্যান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। তাহলে আমরা জানলাম কথা-আখ্যানের ক্ষেত্রে সময় সংক্রান্ত আলোচনার মূল ভিত্তি হল এই অন্তর্গত সময় অনুক্রমের ধারণা। আখ্যান তাত্ত্বিক জ্যানেট সময়ের আলোচনার ক্ষেত্রে যে তুলনামূলোকতাকে ভিত্তি করেছেন তা হল –

> "The relationship between the time of the story and the time of the discourse is expressed"[১]

অর্থাৎ কাহিনির সময়কাল ও বাচনে সেই সময়কাল কীভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তার সম্পর্ক নির্ণয়ের উপর জোর দিলেন। কাহিনির সময়, যা রিমন কেননের মতে, "an ideal' 'natural' chronology"[২] বা আদর্শ 'স্বাভাবিক' একক সময়ক্রম, যা বাচনে পুনঃর্বিন্যস্তভাবে প্রকাশ পায়। নিম্নে একটি চিত্রের দ্বারা বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে –

কাহিনির সময়ক্রম (প্রকৃত সময়ের অনুক্রমে ঘটনার বিবরণ)

ক১ – খ২ – গ৩ – ঘ৪ – ঙ৫

বাচনের সময়ক্রম (ঘটনার বিপর্যস্ত বা পুনর্বিন্যস্ত ক্রম)

গ৩ – ঘ৪ – ক১ – খ২ – ঙ৫

এই দুই বিন্যাসের আন্তঃসম্পর্কেই কথা-আখ্যানের কিংবা উপন্যাস-ছোটোগল্পের সময়ক্রমের কিংবা বিন্যাসের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সময়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা নেবার পর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিরিখে কাহিনির বাচনস্তরে কিভাবে 'সময়' ধারণা প্রযুক্ত হয়েছে তা আমরা দেখে নিতে পারি–

আখ্যানকালের সীমা 'মুক্ত' (open) ও 'বদ্ধ' (closed) পরিসর ভেদে নির্ধারিত। রাখালদাসের সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসই বদ্ধ পরিসরভুক্ত। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কালসীমায় (আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত) কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা রমেশচন্দ্র মজুমদারের বহু উপন্যাস এই সময় পরিসর গোত্রভুক্ত। যেমন, 'দুর্গেশনন্দিনী'-র সূচনাবাক্য ও সমাপ্তিবাক্যের দিকে আমরা নজর দিতে পারি, -

> "৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিল।" (সূচনাবাক্য)
>
> "ফুল ফুটিল। অভিরাম স্বামী গড় মান্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎ সিংহের পাণিগৃহিত্রী করিলেন।" (সমাপ্তিবাক্য)

অর্থাৎ, কাহিনিকালের সীমা বা পরিসর এক্ষেত্রে বদ্ধ। ঘটনার অভিমুখ একমুখী। রাখালদাসের উপন্যাসেও এই ধরনের কাহিনির বদ্ধপরিসরতা লক্ষণীয়, 'ময়ূখ' উপন্যাস থেকে –

> "খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ বৎসরে, ভাদ্র মাসে, প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষে একখানি দীর্ঘাকার নাতিপ্রশস্ত নৌকা দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছিল।"[৩] (সূচনাবাক্য)
>
> "শীতের অপরাহ্ণে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আগ্রা দুর্গের অনতিদূরে শ্যামল তৃনক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া লাগিল। ... পুরুষ নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভুবন সমাধি কোথায়?"[৪] (অন্তিমবাক্য)

অর্থাৎ কাহিনির সীমা এক্ষেত্রে বদ্ধ।

এছাড়াও রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথনরীতিও 'শুন্যমাত্রার কথন' বা 'zero grade narration'। অর্থাৎ তাঁর সমস্ত উপন্যাসই বা উপন্যাসের কাহিনিগত থিম, শিরোনাম, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ কিংবা উপপরিচ্ছেদে বিভক্ত। এটা অন্যমাত্রায় বিষয়ক্রমের ধারণা দেয় পাঠককে। এক্ষেত্রে কাহিনিকে বিভিন্ন উপাদানে বিন্যস্ত করে একটা কাহিনিগত থিমের ধারণা পাওয়া যায়। অমিতাভ দাসের মতে -,

> "এ কথনে কথকের দায় নেই। গ্রন্থের নামকরণ, অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বিভাগ, অধ্যায়-পরিচ্ছেদ ইত্যাদির শিরোনাম বা উপ-শিরোনাম–এগুলি কাহিনি-কথনের বহিরমহল–লেখকের হস্ত-অবলেপন যেখানে স্পষ্ট। তাঁর সৃষ্ট কথককে সরিয়ে নেন লেখক।"[৫]

রাখালদাসও তাই করেছেন। তিনি কাহিনির বাচনস্তরে বিভিন্ন বাচনভঙ্গির দ্বারা সাজিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসের কাহিনিগত থিম। রাখালদাসের 'ধ্রুবা' উপন্যাসের দ্বারা বিষয়টি বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

ধ্রুবা : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ – নটীপল্লী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – সমুদ্রগৃহ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ – মহাদেবী, চতুর্থ পরিচ্ছেদ – বাগদত্তা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ – আর্য্যপট্ট, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – মাধবসেনা, সপ্তম পরিচ্ছেদ – রুদ্রধরের প্রায়শ্চিত্ত, অষ্টম পরিচ্ছেদ – শ্মশানে, নবম পরিচ্ছেদ – মাধবসেনার গৃহ, দশম পরিচ্ছেদ - দত্তদেবীর প্রত্যাবর্ত্তন, একাদশ পরিচ্ছেদ – মথুরা যাত্রা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – রামগুপ্ত, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – শক ধ্বংস, চতুর্থ পরিচ্ছেদ – রাজার অত্যাচার, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ – হত্যা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ – অন্যপূর্ব্বা কন্যা।

অর্থাৎ 'ধ্রুবা' উপন্যাসের কাহিনিগত 'থিম' বা 'বিষয়ক্রম' রাখালদাস এভাবে পরিচ্ছেদ ও তার উপ-পরিচ্ছেদের শিরনামের দ্বারা সাজিয়ে তুলেছেন। ধ্রুবা উপন্যাসে রাখালদাস প্রাচীন গুপ্তযুগের ইতিহাসকে পুনর্নির্মিত করেছেন। উপন্যাসে নায়ক সমুদ্রগুপ্ত পুত্র চন্দ্রগুপ্ত ও নায়িকা ধ্রুবা দেবী। অপরপক্ষে সমুদ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জয়স্বামিনীর পুত্র রামগুপ্ত

পিতার সিংহাসনের প্রতি প্রলুব্ধ। এমন সময় গুপ্তরাজ্য পাটালীপুত্র বহিঃশত্রু শক দ্বারা আক্রমিত হতে থাকে। এই সুযোগে ছলনা করে সিংহাসন সমুদ্রগুপ্তের কাছে রামগুপ্ত কেড়ে নেয়, জয়স্বামিনীর তৎপরতায়। ধ্রুবা দেবীকে শক রাজা ভেট হিসাবে পেতে চাইল। ধ্রুবাদেবী সেখানে গেলেন। অন্যদিকে রামগুপ্তকে রাজা বলে সমাজ মেনে নিল না। দিন দিন রুচিপতির সহযোগিতায় রামগুপ্তের অত্যাচার বেড়ে উঠল। শেষে রামগুপ্তের মৃত্যু হল বৃদ্ধ সন্ন্যাসীবেশী রবিগুপ্তের হাতে। চন্দ্রগুপ্ত ও ধ্রুবার মিলন হল, পাটালীপুত্রের রাজপদে চন্দ্রগুপ্ত আসীন হল। এখানে এই কাহিনি ক্রম পরিচ্ছেদে- উপ-পরিচ্ছেদের শিরোনামে বিন্যস্ত। অন্যদিকে 'শশাঙ্ক' উপন্যাসের বিষোয়ক্রমে আবার অন্যভাবে এই 'শুন্যমাত্রার কথনরীতি' ব্যবহার করেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, -

শশাঙ্ক : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম ভাগ : প্রভাতে

প্রথম পরিচ্ছেদ – শোন-সঙ্গমে ও দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ – বন্ধুগুপ্তের সন্ধানে।

এখানে বাইশটি পরিচ্ছেদে শশাঙ্কের বাল্যজীবন থেকে কৈশোর জীবনের (চোদ্দ বছর) ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ অধ্যায় নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এই পরিকল্পনা। 'প্রভাতে' অর্থাৎ রাজা শশাঙ্কের জীবন প্রভাতের সঙ্গে তুল্য।

দ্বিতীয় ভাগ : মধ্যাহ্নে

প্রথম পরিচ্ছেদ – স্কন্ধগুপ্তের গীত থেকে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ – নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশ।

উক্ত ভাগে শশাঙ্কের জীবনের মধ্যভাগ আলোচিত, যেটা নামকরণের দ্বারা চিহ্নায়িত হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ : সায়াহ্নে

প্রথম পরিচ্ছেদ – পিঙ্গলকেশ অতিথি থেকে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ –অনন্ত যাত্রী।

উক্ত ভাগে শশাঙ্কের জীবনের শেষ পরিণতি অঙ্কিত। 'সায়াহ্নে' নামে তা বেশ স্পষ্ট।

২

আগেই বলা হয়েছে যে, কাহিনির সময়ক্রম বাচনে অনুরূপভাবে বিন্যস্ত হয় না। কখনো আগের ঘটনা পরে, এবং পরের ঘটনা আগে বাচনে লেখকের কৌশলানুসারে পুনঃর্বিন্যস্ত হয়। এই কাহিনির পুনঃর্বিন্যস্তক্রমকে জ্যানেট 'বিপর্যস্তক্রম' (anachronies) অভিধায় ভূষিত করেছেন। আখ্যান বাচনে এই কাহিনির বিপর্যস্ততা ঘটে সাধারণত 'অতীত কথন' (Flash back), ও 'ভবিষ্যৎ কথন' (Flash forward) এই দুই পদ্ধতিতে। Genette-এর পরিভাষায় যথাক্রমে analepses ও prolepses। অমিতাভ দাসের মতে,- 'পশ্চাৎ-উদ্ভাস' ও 'পূর্ব-উদ্ভাস'। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই দুই রীতির কথন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সময়ের বিপর্যস্ত ক্রমের ধারণা নেওয়া যেতে পারে,-

অতীতকথন রীতিটি বাংলা উপন্যাসে একটি অতিপরিচিত পদ্ধতি। অধিকাংশ আত্মকথনরীতি যুক্ত উপন্যাসে এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বহুপঠিত শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সূচনাবাক্য স্মরণ করতে পারি আমরা, -

> *"আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায়, ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।" (১/১)*

তবে, এই অতীতকথন যখন কথকের, সেহেতু তিনিই কাহিনিতলের ভিতরের কোন চরিত্র হয়ে উঠেছে। আর এই ঘটনা তারই জীবনের ঘটে যাওয়া অনতিদুরবর্তী কোন ঘটে যাওয়া স্মৃতির পুনরাবৃত্তি। অনুরূপ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথন রীতিতে লেখা দুটি উপন্যাস হল, 'পাষাণের কথা' ও 'হেমকণা'। এই দুই উপন্যাসে 'পাষাণ' ও 'সুবর্ণমুদ্রা' কথকের নির্বাচিত দুই চরিত্র হয়ে উঠেছে। যাদের জবানীতে সমগ্র উপন্যাসের কথাবস্তু বর্ণিত হয়েছে। তাই এই দুই উপন্যাসে এই পশ্চাৎ-উদ্ভাস বা অতীতকথন ব্যবহৃত হয়েছে সর্বাধিক। যেমন, 'পাষাণের কথা' উপন্যাসে অতীতকথন এসেছে এভাবে, -

> "আমার সময়ের ধারণা নাই, সুতরাং আমার জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে কত কাল অতীত হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিতেছি। শৈশবের কথা এইমাত্র মনে পড়ে যে, প্রশস্ত সমুদ্র সৈকতে আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ খেলা করিয়া বেড়াইতাম।"[৬]

আবার 'হেমকনা' উপন্যাসে অতীতকথন ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে –

> "আমি বহু প্রাচীন, এমনকি তোমাদিগের মানবজাতি অপেক্ষাও প্রাচীন। তুমি যদি বিশ্বাস কর তাহা হইলে আমার জন্মকথা বলি, তুমি শুনিয়া যাও। অনেকদিন পূর্ব্বে দিন, মাস, বৎসর, কাল প্রভৃতি নামকরণ হইবার বহু পূর্ব্বে, ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে আমি জন্মগ্রহন করিয়াছিলাম।"[৭]

তবে শুধুমাত্র আত্মকথন রীতিতেই যে এই অতীতকথন ব্যবহৃত হয় তেমনটা নয়। অনেক সময় উপন্যাসের সূচনায় কিংবা পরিচ্ছেদ, উপ-পরিচ্ছেদে কোন স্থানিক বর্ণনায়, চারিত্রিক বর্ণনায়, বিরতির ক্ষেত্রে এই অতীতকথন ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এর উদাহরণ উপন্যাসে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা বোঝার স্বার্থে কয়েকটি উদাহরণ তুলে বিষয়টি বুঝে নিতে পারি এভাবে –

রাখালদাসের 'ময়ূখ' উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 'পরিচয়' অংশে ললিতা যখন তার মাসি বিনোদিনীর প্রকৃত পরিচয় জানতে চায়, তখন বিনোদিনীর পরিচয় প্রদানে, রাখালদাস এই অতীতকথন পদ্ধতির অবলম্বন করেছেন, -

> "মামা চৌদ্দ বৎসর পূর্বে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে গঞ্জালিস আমাকে ও আমার ভ্রাতৃজায়াকে খড়দহ হইতে ধরিয়া আনিয়াছিল। আমি বাল-বিধবা, তোমার মামী মরিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, আর আমি পাপের পসরা বহিয়া মরিতেছি।"[৮]

আবার 'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'নূর বাঈ' অংশে কথক অতীতকথন পদ্ধতিতেই গোলাপি বাঈ-এর পরিচয় প্রদান করেছেন, -

> "সেটা ইংরেজী ১৭৩৯ সাল। তখন বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইয়াছে। সুজাউদ্দৌলা মৃত্যুর পূর্ব্বে দীর্ঘকাল মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যার মুখদর্শন করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতার নিকট মুর্শিদাবাদে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আক্রম জমান খাঁ প্রাণভয়ে দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় সুযোগ্য সাহেজ্ঞাদা মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ হইতে রূপবতী ব্রাহ্মণ বিধবা গোলাপীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।"[৯]

'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাসে সময়বিন্যাসে অতীতকথন যেভাবে রাখালদাস ব্যবহার করলেন, তার একটি চিত্র উক্ত উদাহরণ অনুসারে থেকে দেওয়া যেতে পারে এভাবে, -

কাহিনিকাল	বাচনকাল	+ কথক	+ নিরীক্ষক	+ আকট্যান্ট (রোল বা চরিত্র)
দিল্লীর অষ্টাদশ শতকের সমাজ, নারীর সমাজে অবস্থান।	১৭৩৯ সালের ঘটনা,যা কথকের অদূরবর্তী সময়ে ঘটেছে, গোলাপীর পরিচয় প্রদানে।	লেখক (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)	লেখক [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কা.ব.)+ আনন্দরাম(কা.অ)] = সর্বজ্ঞকথন	আনন্দরাম (প্রধান চরিত্র)

অতীতকথনের সৃষ্টি

কাহিনিকাল | বাচনকাল ⟹ বিপর্যস্ত | কাহিনিতলের মধ্যে
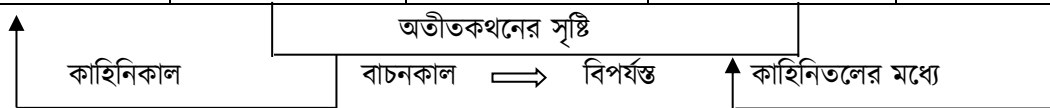
ক.ব. = কাহিনিতলের বাইরে। কা.অ. = কাহিনিতলের অন্তর্গত।

আবার ঐতিহাসিক স্থানিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন রাখালদাস তাঁর 'ধ্রুবা' উপন্যাসের পনেরতম পরিচ্ছেদের 'হত্যা' অংশে, -

> "শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে গুপ্তরাজবংশের বিস্তৃত প্রমোদ উদ্যান। এখন তাঁহার চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শোণের দুই তিনটি শাখা এই ক্রেশিব্যাপী বিস্তীর্ণ উপবনের মধ্যে পড়িয়া কৃত্রিম হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে এই বিশাল উদ্যানের প্রবেশ পথে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী উপস্থিত থাকিত।"[১০]

এছাড়াও আখ্যানের কাহিনিকাল সর্বদা একটি সময় পর্বে সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনও কখনও তা বাচনে কাহিনিকালের থেকেও কোনো পূর্ববর্তী ঘটনার নিরিখে মূল কাহিনিকাল পিছিয়ে যেতে পারে অনেকখানি। ফলে মূল কাহিনিকালক্রমের ঘটে বিচ্যুতি। এই পদ্ধতি দ্বারা অনেকসময়য় লেখক তাঁর কাহিনির মূল প্লট পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে এই অতীতকথন হয়ে ওঠে মূল কাহিনির অভিমুখ বদলের প্রধান হাতিয়ার। বিষয়টি রাখালদাসের 'ধ্রুবা' উপন্যাস থেকে বুঝে নিতে পারি এভাবে,

উপন্যাসের সূচনা অংশটি হল,-

> "এখন হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের শেষ দিকে নটী-পল্লীর সহিত রাজপথের সংযোগস্থলে নটীমূখ্যা মাধবসেনা অনেকগুলি নারীবেষ্টিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতেছিল। সকলেই তাহাদের মুখ্যা মাধবসেনাকে রাজদ্বারে রামগুপ্ত নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বলিতেছিল।"[১১]

অর্থাৎ, উপন্যাসের কাহিনিকাল কথনকাল অপেক্ষা দেড় হাজার বছর পূর্বের। কিন্তু এই কাহিনি কালই বাচনকালে উপস্থাপিত হয়েছে তারও পঁচিশ বছর পূর্বের একটি ঘটনা দিয়ে। সেটি মূল কাহিনিকালের ক্রমকে বিপর্যস্ত ক'রে অতীতকথনের দ্বারা গড়ে উঠেছে।

কাহিনি ক্রম –

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
দেড় হাজার বছর আগে রামগুপ্তের হাত থেকে চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মাধবসেনা উদ্ধার।	*চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় প্রদান ও ধ্রুবার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কের ইঙ্গিত।*	*পিতা সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনের প্রতি রামগুপ্ত প্রলুব্ধ হয়ে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিরোধ।*	*জয়স্বামিনী কর্তৃক পঁচিশ বছর আগে সমুদ্রগুপ্তের কাছে প্রতিজ্ঞাকরণ, যে তাঁর পুত্র হলে সে রাজ্যের রাজা হবে।*	*রামগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ ও রাজ্যের প্রজাদের উপর অত্যাচার।*

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পেলাম, কাহিনিকালক্রম যা ; তা বাচনস্তরে আরও পঁচিশ বছর আগের ঘটনা থেকে উপন্যাসের ঘটনা শুরু হয়েছে। যা আমি 'ঘ' নামাঙ্কিত বর্ণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

আখ্যানের বিপর্যস্তক্রম ঘটে ভবিষ্যৎকথনের (flash forward) দ্বারাও। তবে কথা-আখ্যানে অতীতকথনের মত ভবিষ্যৎকথন এতটা সুলভ নয়। কারণ, ভবিষ্যৎকথন হল *'anticipatory summary' (genette, 1983,63)* বা আগাম সারাংশ। কিংবা আখ্যানবিদ তোদারভের ধারণায় তা *'plot of predestination' (ibid)*– অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত। এই পূর্বনির্ধারিত ভবিষ্যৎকথনের ভাবনায় তাই অনেকটা নিয়তিবাদের প্রসঙ্গ চলে আসে। আসলে, কাহিনির শুরুতেই যদি শেষে কী হবে বলে দেওয়া হয়, তাহলে কাহিনির বাকি অংশটা হয়ে যায় শেষাংশে পৌঁছাবার সারাংশ মাত্র। সেক্ষেত্রে পাঠকের কাহিনির প্রতি আকর্ষণ বিলোপন ঘটে যাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। তাই এই নিয়তি নিয়ন্ত্রিত বা পূর্বনির্ধারিত ভাবনার প্রকাশ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপন্যাসে সচরাচর রাখতে চান না। তবে উপন্যাসের বাচনে ভবিষ্যতের আভাস (hint) তিনি দিতেই পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসে এই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যেমন, 'বিষবৃক্ষ' (১৮৬২) উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই, যে পরবর্তী কাহিনির ঘটনা কি ঘটতে পারে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বাচনস্তরে কাহিনির সময়ক্রমে এই ভবিষ্যৎ আভাস নির্ধারিত। কখনো তা ভবিষ্যদ্বাণী, কখনো তা জ্যোতিষী মারফৎ অদৃষ্ট গণনা দ্বারা ব্যক্ত। 'শশাঙ্ক' উপন্যাস থেকে উদাহরণ তুলে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে,-

> "যূথিকা কর্ণ হইতে বহুমূল্য রত্নাভবণ খুলিয়া জ্যোতিষীর হস্তে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে কহিলেন, 'মা, তুমি রাজরানী হইবে'। তাহার পরে চিত্রার হস্ত দেখিয়া জ্যোতিষী কহিলেন, 'তুমি একরাত্রির জন্য রাজরানী হইবে'। লতিকার হস্ত পরীক্ষা করিয়াও কহিলেন, 'সমুদ্রতীরে মহারাজের সহিত তোমার গান্ধর্ব বিবাহ হইবে। মা, তুমিও একদিনের জন্য রাজরানী হইবে'। ...যুথিকা তরলার হাত ধরিয়া জ্যোতির্বিদের নিকটে লইয়া গেল। জ্যোতির্বিদ অনেক্ষন ধরিয়া তাহার হস্ত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, 'তুমি প্রথম জীবনে কষ্ট পাইবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে রাজরাণী হইবে। তুমি রোহিতাশ্ব দূর্গের অধীশ্বরী হইবে।"[১২]

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ভবিষ্যৎকথন হল, আখ্যানে 'পূর্বনির্ধারিত' বা 'নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত'। সেক্ষেত্রে কাহিনি পরে কি ঘটবে কিংবা কাহিনির অভিমুখ কোন দিকে যাবে, তা পূর্বেই বলে দেওয়া হয়। এতে কাহিনির ঘটনা ক্রম দুর্বল হয়ে পড়ে। 'সাস্পেন্স সিকুয়েন্স' আখ্যানের নষ্ট হয়ে পড়ে। উক্ত উদাহরণে তাই দেখলাম আমরা। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে কি ঘটবে তা এই ভবিষ্যৎকথনের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত হয়ে গেল। ফলে উপন্যাসের পরবর্তী অংশ হয়ে পড়ল শিথিল বা দুর্বল, পাঠকের কাছে। একই ভাবে 'করুণা' উপন্যাসের বিষয়ক্রম যখন ভবিষ্যৎ কথন দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন উপন্যাসের পরবর্তী অংশ পাঠকের কাছে শিথিল হয়ে পড়ে, -উপন্যাসের পটভূমি যখন স্কন্ধগুপ্তের দ্বারা প্রাচীন হুন জাতির পরাজয় কাহিনি, তখন সেই কাহিনিই যখন আগে ব্যক্ত হয়ে যায়, তাহলে উপন্যাসের অবশিষ্ট আর কি থাকে? উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ 'কণিস্ক-চৈত্যে অতিথি' অংশে উপন্যাসের থিম ব্যক্ত করেছেন রাখালদাস ভবিষ্যৎ কথনের দ্বারা,-

> "বোধিসত্ত্বপাদ নাগার্জুন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই নাসিক্যবিহীন জাতি কর্তৃক কণিষ্ক-চৈত্য বিনষ্ট হইবে। 'আশ্চর্য ! আপনারা এই তিন বৎসর যাবৎ হূণ আক্রমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।' 'হা।' 'দেশ ও ধর্মরক্ষার কোনও উপায়ালম্বন করিয়াছেন কি?' 'উপাই নাই বলিলেই হয়, কোন উপায়ে হূণগণকে বক্ষুর পরপারে রাখিয়া আসিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হয়।' 'এমন কার্য কে সম্পন্ন করিবে?' 'না হইলে সমস্ত যাইবে।' 'এখন গুপ্তবংশের সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে?' 'সর্বপ্রথম মহারাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত ও পরে স্কন্ধগুপ্ত।"[১৩]

৩

আখ্যানের সময় ধারণার দ্বিতীয় উপাদান হল, কাহিনির ব্যাপ্তিকাল বা স্থিতিকাল (duration)। অর্থাৎ কাহিনির সময় আর বাচনে সেই সময় কীভাবে প্রকাশ লাভ করছে তার সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে আলোচনা। এই আখ্যানের স্থিতিকালকে আখ্যানের সীমার মধ্যে থেকেই, আখ্যান অন্তর্গত উপাদান দিয়ে বুঝে নেওয়ার জন্য 'গতি' (speed, spese) ধারণাটির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ কাহিনির বাচন আবরণ টেক্সট নির্ভর। অমিতাভ দাসের মতে–

> "কালের স্থায়িত্ব বা কাহিনির স্থিতিকাল আর টেক্সটের গতি পরস্পর সাপেক্ষ। যেখানে গতি সবচেয়ে বেশি, সেখানে সবচেয়ে কম টেক্সট পরিসর ব্যয় হয়।"[১৪]

এই ঘটনাকে অবলোপন বা এলিপসিস বলা হয়। অবলোপন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আখ্যানের বাচনে কাহিনির সময়ের মেয়াদ, কিংবা বাচনের সময় (দৈর্ঘ্য) আর সেই প্রেক্ষিতে 'গতি'র পরিবর্তন সাপেক্ষে কাহিনির ব্যাপ্তিকালের চলন বা movement নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আখ্যানবিদ মিক এই পাঁচ ধরণের movement –দ্বারা কাহিনি বাচনে 'tempi'–র সৃষ্টি হয় বলে জানিয়েছেন। অলোক চক্রবর্তী তাঁর 'আখ্যানের তত্ত্বভুবন' গ্রন্থে এই পাঁচ ধরণের চলনের একটি চিত্র প্রদান করেছেন, সেখান থেকে আমরা এটি বুঝে নিতে পারি এভাবে ,-

নাম (Name)	কাহিনি-সময় (কা.স.) (story time)		বাচন-সময় (বা.স.) (Discourse Time)	গতি (Speed)
অনুক্তি (Ellipsis)	€ কা.স. (€ = বিদ্যমানতা)		× বা.স. (× = অনস্তিত্ব)	সর্ব্বোচ্চ গতি
সারাংশ(Summary)	কা.স.	>	বা. স.	দ্রুত গতি
দৃশ্য(Scene)	কা.স.	=	বা.স.	অপরিবর্তিত গতি
বিস্তার (Stretch)	কা.স.	<	বা.স.	ধীর গতি
বিরতি(Pause)	×কা.স.		€ বা.স	স্থির গতি

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে কাহিনির স্থিতিকাল এই পাঁচ ধরণের উপাদানের নিরিখে বিচার করে দেখব আমরা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনিকাল কথনকাল অপেক্ষা বহুপূর্বের। অর্থাৎ তিনি কাহিনিকালে সময় ব্যবহারের দ্বারাই প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের পুনঃনির্মাণ করেছেন। সেক্ষত্রে 'অনুক্তি' হল একটি অন্যতম উপাদান। আসলে আমরা পূর্বে একথা উল্লেখ করেছি যে, কাহিনিতে যে সময়ক্রমে ঘটনাগুলি ঘটেছে বাচনে সেই সেই ক্রমে ঘটনাগুলি উপস্থাপিত হয় না। এই সময়বিন্যাস আলোচনা তো একপক্ষে তারই আলোচনা। কিন্তু কাহিনিতে যা যা ঘটে তাঁর সব ঘটনাই কি আখ্যানের বাচনস্তরে উপস্থাপিত হয়? হয় না! যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপঠিত উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' তে বাচনে বলা হয়েছে তারাচরণের সঙ্গে কুন্দর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ঐ বলাটুকুই রয়েছে বাচনে ; বিবাহের দিনের কথা বাচনে অনুল্লিখিত। এটাকেই অনুক্তি বা এলিপসিস বলতে পারি আমরা। এই অনুক্তি আবার বাচনে কখনো 'আভাসিত' আকারে থাকতে পারে, আবার কখনো 'ঘোষিত' আকারেও থাকতে পারে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাস থেকে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যেতে পারে, -

> "এক বৎসর কাটিয়া গেল। দূত ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া নাদীর শাহ মোগল সাম্রাজ্য আক্রমন করিতে উদ্যত হইল" (পৃ.১৫)

কিংবা,

> "কর্নালের যুদ্ধের বারোদিন কাটিয়া গেল। দিল্লির লোক শুনিল যে সাদৎ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় বাদশাহ নাদির শাহের বন্দী হইলেন।" (পৃ.২৬)

'অনুক্তি'র উদাহরণ পাই 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রথম ভাগ 'প্রভাতে' অংশে শশাঙ্কের বাল্য-কৈশোর জীবন বাইশ পরিচ্ছেদ জুড়ে বর্ণিত। সেখানে শশাঙ্কের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে শেষে চোদ্দ বছর। কিন্তু উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের 'মধ্যাহ্নে' অংশের সূচনায় ঘটেছে কাহিনি সময়ের অনুক্তি। সেখানে ঘটনা শুরু হয়েছে সতের বছরের শশাঙ্কের রাজ্য পরিচালনার কাহিনি দিয়ে। অর্থাৎ এই মাঝের তিন বছর বাচন স্তরে উল্লেখিত নেই। কীভাবে শশাঙ্ক রাজা হলেন, তাঁর কৈশোর জীবনের চপলতা তিনি ত্যাগ করলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু এর আভাস উপন্যাসের সূচনা বাক্যে রাখালদাস দিয়েছেন এভাবে, -

> "পূর্বোক্ত ঘটনার পর তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে মগধ রাজ্য ও পাটালিপুত্র অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ...যুবরাজ কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পন করিয়াছেন, কৈশোরের বালসুলভ চপলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। যৌবনে যুবরাজ ধীর, শান্ত ও চিন্তাশীল।"[১৫]

আবার এই সময়ের অবলোপন ঘটতে পারে একটি অনুচ্ছেদের মধ্যেও। কিংবা দুটি অনুচ্ছেদের সংযোগস্থলে। 'শশাঙ্ক' উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগ 'মধ্যাহ্ন' অংশের দশম পরিচ্ছেদ 'শঙ্করনদের যুদ্ধ অংশে-এর উদাহরণ দিয়েছেন রাখালদাস। কাহিনি এই,- শশাঙ্ক বঙ্গ বিজয়ের জন্য যাত্রা করলে পথে কামরূপ সেনা দ্বারা আক্রমিত হন, যা উপন্যাসে শঙ্করনদের যুদ্ধ নামে অবিহিত। এক্ষত্রে ঘটনার কালক্রম প্রায় সমান গতিতে চলছিল। কিন্তু একটি অনুচ্ছেদে কালক্রমের অবলোপন ঘটিয়ে রাখালদাস ঘটনার গতি বৃদ্ধি ঘটালেন, -

> "দুই দিন পরে শঙ্করনদের যুদ্ধ সূচিত হইল। ... শঙ্করনদের যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে সংবাদ আসিল যে, পদাতিক সেনা লইয়া নরসিংহ দত্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর একদিন পরে শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ... পরদিন প্রথম প্রহর অতীত হইলে পদাতিক সেনা আসিয়া পৌঁছিল এবং নদপার হইয়া শঙ্করের উত্তরতীরে শিবির সংস্থাপন করিল। বার বার পরাজয় ও আকস্মিক বিপৎপাতে ভাস্করবর্মার অবশিষ্ট সেনা ছত্রভং হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তিনি বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিতেছিল না। শঙ্করনদের যুদ্ধের একমাস পরে পঞ্চবিংশ সহস্র সেনা লইয়া ভাস্করবর্মা যুবরাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। শশাঙ্ক তখনও শঙ্করতীরের শিবিরে।"[১৬]

কথক কাহিনির কোন্ অংশকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, সেই অনুযায়ী টেক্সটের কাহিনির স্থায়িত্বের হেরফের ঘটে বাচনে। সমগ্র 'শশাঙ্ক' উপন্যাসের কাহিনির স্থায়িত্ব দেখানো যেতে পারে এভাবে, -

শশাঙ্ক : প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে

উপন্যাসে টেক্সট পরিসর (তিনটি ভাগ একত্রে)	কাহিনির স্থায়িত্ব (২২+১৮+১৭)= ৫৭ পরিচ্ছেদ)
১-১৪ পরিচ্ছেদ	১ বছরের শশাঙ্কের বাল্যজীবনের কাহিনি বর্ণিত
১৫-২২ পরিচ্ছেদ	১৪ বছর (চতুর্দশবর্ষীয়া শশাঙ্ক) মধ্যবর্তী ১৩ বছর অবলোপ বা এলিপসিস।
১-৮ পরিচ্ছেদ	১৭ বছর (পূর্বক্ত ঘটনার তিন বৎসর অতিবাহিত) মধ্যবর্তী ৩ বছর অবলোপ।
৯-১৫ পরিচ্ছেদ	২১ বছর (চারি বৎসর পরে), মধ্যবর্তী ৪ বছরের অবলোপ।
১৬-১৮ পরিচ্ছেদ	২৬ বছর (মেঘনাদের যুদ্ধে পর পাঁচ বছর অতিবাহিত), মধ্যবর্তী ৫ বছর অবলোপ।
১-১৭ পরিচ্ছেদ	পরবর্তী ১ বছরের কাহিনি বর্ণিত।

আখ্যান কথনে কাহিনির দীর্ঘ সময় বাচনে যখন স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত হয় তখন তাঁকে সারাংশ (Summary) বলে। সারাংশের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জ্যানেট জানিয়েছেন,-

> "... the narration in a few paragraphs or a few pages of several days, months or years of existence, without details of action or speech."[১৭]

অর্থাৎ, কয়েকটি অনুচ্ছেদে বা পৃষ্ঠায় বহু দিন-মাস-বছরকে ধরা। সারাংশ ব্যবহার যখন হয় তখন, বাচনের সময় থাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সারাংশের ব্যবহার করেছেন কোনো অতীত কাহিনি বর্ণনে, কিংবা কোনো চরিত্রের আন্তঃসম্পর্কের অন্তর্ঘাত নির্দেশ করতে। যেমন,- 'ধ্রুবা' উপন্যাসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, 'সমুদ্রগৃহ' অংশে যখন সমুদ্রগুপ্তের পর গুপ্তরাজ্যের ভাবি যুবরাজ কে হবে এই নিয়ে, দত্তদেবী, জয়স্বামিনী ও সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে বাক্‌বিতন্ডা চলছে, এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য পরিচালনার দাবি জোরালো হয়ে ওঠে, তখন জয়স্বামিনী পঁচিশ বছর আগের কাহিনির কথা স্বরণ করান, সমুদ্রগুপ্তকে। এক্ষেত্রে রাখালদাস পঁচিশ বছরের ইতিহাস আখ্যানে সারসংক্ষেপাকারে বাচনে প্রয়োগ করেছেন। আবার, 'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাসে ১৭৩৯ সালের বাংলার ইতিহাস কথা শোনাতে গিয়ে সারাংশের উপর নির্ভর করেছেন তিনি, এটা চরিত্রের স্মৃতিগত বা চিন্তাসূত্রে সারাংশ নির্মাণের একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে, যার দ্বারা কাহিনিতলের ভেতর থেকে নিরীক্ষণের দ্বারা ইতিহাসের পুনঃনির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। -

> "সেটা ইংরেজী ১৭৩৯ সাল। তখন বাঙ্গালার সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইয়াছে। সুজাউদ্দৌলা মৃত্যুর পূর্ব্বে দীর্ঘকাল মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যার মুখদর্শন করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ পিতার নিকট মুর্শিদাবাদে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আক্রম জমান খাঁ প্রাণভয়ে দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় সুযোগ্য সাহেঞ্জাদা মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ হইতে রূপবতী ব্রাহ্মণ বিধবা গোলাপীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন।"[১৮]

এছাড়াও সারাংশের কাজ আখ্যানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কাহিনির দীর্ঘ পরিসরতাকে স্বল্প পরিসরে বাচনে উপস্থাপিত করার কৌশল হিসাবে কাজ করে সারাংশ। সেক্ষেত্রে বাচনে এটি পশ্চাৎপটের ভূমিকা পালন করে। মূলত এটি আখ্যানের প্রারম্ভিক অংশেই যোজিত হয় বহুল পরিমাণে, তবে বাচনে নতুন কোনো প্রসঙ্গ, কোনোও নতুন চরিত্র, সংযোজন কালেও সারাংশ পশ্চাৎপট হিসাবে কাজ করে। যেমন, 'ধর্মপাল' উপন্যাসের প্রারম্ভিক অংশে একটি মন্দির প্রসঙ্গে স্থানিক বর্ণনায় উঠে এসেছে কথকের প্রাচীন ইতিহাসের বহু শতবছরের সারাংশ কাহিনি, -

> "পদ্মার উৎপত্তিস্থানের অনতিদূরে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে একটি প্রাচীন দেবমন্দির ছিল। বহু শত বৎসর পূর্বে মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল ; কালে তাহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতে যে দেবমূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বহুপূর্বে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ...গৌড় হইতে

সপ্তগ্রামের পথে ইহা পথিকদের বিশ্রামের স্থান ছিল ; গঙ্গা পার হইয়া এই মন্দির পর্যন্ত আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, সেই জন্য পথিকগণ এই ভগ্ন মন্দিরে অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে রাত্রিতে আশ্রয় লইত।"[১৯]

আবার আমরা দেখি, বাচনে ধারাবাহিক সময়-উপস্থাপনে যদি ছেদ পড়ে তখন দুই সময়-পর্বকে জোড় মেলাতে সারাংশের ব্যবহার করে থাকেন লেখকেরা।

"সম্রাটের পরাজয় সংবাদ যখন দিল্লীতে পৌঁছিল, তখন দিল্লীর চারিদিকে লুটতরাজ আরম্ভ হইল। পথ ঘাট বন্ধ হইয়া গেল। দিল্লীর মত বড় সহরে খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে থাকে না। সুতরাং দ্বিতীয় দিন হইতে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। আহির গোয়ালারা সহরে দুধ আনা বন্ধ করিল। বণিয়ারা একদিনে চাউল ও আটার দর দশগুণ চড়াইয়া বসিল। ...

এই রূপে কর্নালের যুদ্ধের পর বারো দিন কাটিয়া গেল। ...নাদির শাহ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লইয়া কর্নাল হইতে পারস্যে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন।"[২০]

আবার 'ধর্মপাল' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে,-

"প্রাচীন গুপ্তবংশের পিণ্ডলোপ হইয়াছে। যশোবর্মা যখন পাটালিপুত্র ধ্বংস করে, তখন সে সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণকে নৃশংশভাবে হত্যা করিয়া গিয়াছে। শ্বেতছত্রদ্বয় এতদিন গদাধরের মন্দিরে পড়িয়া ছিল ! মণিমুক্তা ও সুবর্ণের লোভে চন্দ্রাত্রেয়রাজ গরুড়ধ্বজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, সিংহাসন শূন্য, প্রাসাদ শূন্য, পাটালিপুত্র শূন্য।"[২১]

'শশাঙ্ক' উপন্যাসে মেঘনাদের যুদ্ধের পর, গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের মৃত্যু হয়। মৃত্যু পরবর্তী এক বছরের কাহিনি, একটি অনুচ্ছেদে রাখালদাস বর্ণনা করেছেন সারাংশের দ্বারা, -

"মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের বহু পরিবর্তন হইয়া গেল। গৌড়বঙ্গে শশাঙ্কের সহচরগণ বিদ্রোহী হইল, অনন্তবর্মা দক্ষিণ মগধ অধিকার করিয়া মন্ডলা অধিকার করিলেন। প্রভাকরবর্ধনের অনুরোধে মাধবগুপ্ত চরনাদ্রি ও বারাণসী অবন্তিবর্মাকে প্রদান করিলেন। যশোধবলদেব অবনতমস্তকে সমস্ত অপমান সহ্য করিলেন। শশাঙ্কের প্রত্যাগমনের আশা দিন দিন তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইতেছিল। বুদ্ধগুপ্ত বন্ধুগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধসঙ্ঘের নেতাগণ প্রকাশ্যে ব্রাক্ষন্যের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, তাহাদিগের অত্যাচারে পাটালিপুত্রের নাগরিকগণ অস্থির হইয়া উঠিল। শত শত দেবমন্দিরের ভূসম্পত্তি অপহৃত হইল, সহস্র সহস্র মন্দিরে মহাদেব ও বাসুদেবের পরিবর্তে বৌদ্বমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল; অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দ মহানায়কের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু মহানায়ক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।"[২২]

আখ্যান বাচনে সময়-বিন্যাসের পরবর্তী ধারণা হল, দৃশ্য (scene)। এখানে কাহিনির সময়কে ও বাচনের সময়কে মোটামুটি সম মেয়াদের ধরা হয়। কেননা, দৃশ্য হল, সেই কৌশল উপাদান যা বাচনে সংলাপাকারে উপস্থাপিত হয়। এখানে আখ্যানের গতি থাকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায়। দৃশ্য সম্পর্কে আখ্যানবিদ রিমন-কেনান জানান, -

" ... story-duration and text-duration are conventionally considered identical"[২৩]

অর্থাৎ কাহিনির সময় আর বাচনে উপস্থাপিত সময়ের মেয়াদ সমান ও অপরিবর্তনীয় থাকে দৃশ্য আলোচনায়। বহু বাংলা উপন্যাস- গল্পে এই দৃশ্যরীতির উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি একটা সমগ্র গল্প ও উপন্যাস লিখে ফেলা যায় এই সংলাপাকারে এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে বাংলা সাহিত্যে। সম্পূর্ণ সংলাপাকারে লিখিত গল্প, সন্তোষ কুমার ঘোষের 'দুটি ঘর, একটি নাটক' ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'এক্সপায়ারি ডেট'; অন্যদিকে উপন্যাস হল, শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সবকটিতেই এই দৃশ্যের ব্যবহার হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের উদাহরণ টানার আগে, একটি কথা স্মরণ করে নিতে চাই আমরা। এই দৃশ্য মূলত দুইভাবে আখ্যানে লক্ষ্য করা যায়। এক সম্পূর্ণ সংলাপাকারে ও দ্বিতীয়, সংলাপের সঙ্গে মঞ্চ-নির্দেশনা সদৃশ সামান্য সংযোজন (a few 'stage direction') অংশে। তাই প্রথমটি হল দৃশ্যমূলক বিবরণ, অন্যটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই দুই ধরণের 'দৃশ্য'র ব্যবহার এবার রাখালদাসের উপন্যাসের নিরিখে আমরা দেখে নেব, -

দৃশ্যমূলক বিবরণ

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বহুল সংলাপ ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যাবে। তাঁর 'ধ্রুবা' ও 'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাস দুটিতে কাহিনির বর্ণনা অপেক্ষা এই দৃশ্যের সংযোজন অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের মতে, -

"ধ্রুবায় সংলাপই প্রধান, বর্ণনার সামান্যকিছু বাদ দিলে এটিকে সরাসরি নাটক রূপে ব্যবহার করা যায়। ...অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংলাপ একই লাইনে ছাপা হয়েছে।"[২৪]

প্রতাপচন্দ চন্দ্রের এই উক্তি একেবারে নির্ভুল। রাখালদাসের অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনি বাচন স্তরে বর্ণিত হয়েছে সংলাপাকারে। আসলে রাখালদাস নাটক ভালবাসতেন। নাটকের প্রতি তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন, আর নাটকের সুবহুল বোধ, এই উপন্যাস রচনায় ছায়া ফেলেছে। যেমন,

সংলাপাকারে বা দৃশ্যমূলক বিবরণ

'শশাঙ্ক' উপন্যাসে প্রথম অধ্যায় 'প্রভাতে' অংশের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 'নায়ক সমাগম' অংশটি সম্পূর্ণ হয়েছে, দেশানন্দ ও তরলার সংলাপ দিয়ে। পরিচ্ছেদটি নাটকের মত, যেখানে কাহিনি ও বাচনের স্থায়িত্ব প্রতিসাম্য-মূলক।

"তরলা- ঠাকুর, রাত্রিকালে পাছু লইয়াছিলে কেন বল দেখি?
দেশা- না-না, বড় শীত, তাই একটু-একটু আগুন খুজিতে বাহির হইয়াছিলাম।
তরলা- বল কি ঠাকুর ! এই দারুন গ্রীষ্মে তোমার শীত করিতেছে? তোমার কি বাতিক বৃদ্ধি হইয়াছে?
দেশা- রাত্রিকালে যদি কেহ চিনিতে পারে?
তরলা- তবে কি অভিসারে যাইতে নাকি?
দেশা- না-না, আমরা সংসাররাশ্রমত্যাগী ভিক্ষু, আমাদিগের কি অভিসারে যাইতে আছে?
তরলা- ঠাকুর ! চল, আলোকে যাই।"[২৫]

আবার 'ময়ূখ' উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদ 'সপ্তগ্রামে যুদ্ধ' অংশে দেখি, হবিব ও ফতেমা বিবির সংলাপ, একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে সাজিয়ে বর্ণন করা হয়েছে, সেখানে চরিত্রের নাম উল্লেখও নেই।

"'তলোয়ার লইয়া কি করিবে?' 'কাফের ফিরিঙ্গির সহিত লড়াই করিব।' 'তুমি লড়াই করিতে জান?' 'জানি না জানি, দুই একটার ত মাথা লইতে পারিব?' 'তাঁহারা যে বন্দুক লইয়া লড়াই করিবে?' 'মরি স্বর্গে যাইব। বুরা হবিব বাঁচিয়া থাকিতে তোমার গায়ে কেহ হাত দিতে পারিবে না' 'হবিব, আমি নিজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি' 'কি?'"

আবার,

"রাগ কাহাকে বলে?
ভালবাসা কাহাকে বলে?
কি জানি।
আমি তকে ভালোবাসি।
কি জানি?
তবে তুই কি জানিস?
আমি ত কিছুই জানিনা।"[২৬]

অন্যদিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে সংলাপের সঙ্গে মঞ্চ-নির্দেশনা-সদৃশ সংক্ষিপ্ত বিবরণী অংশও বাচনস্তরে খুব চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে দুটি চরিত্রের সংলাপ ব্যবহারের পূর্বে রাখালদাস সুকৌশল ভাবে তাদের শারীরিক ভঙ্গি (gesture) বা স্থানিক বিবরণ দিয়েছেন। 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে 'মধ্যাহ্ন' অংশের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 'ধীবর গৃহ' একজন নবাগত জেলে ও ধীবর যুবতীর কথোপকথনের মধ্যে দেখতে পাই-

"নবাগতের একহস্তে দীর্ঘ বর্শা ও অপরহস্তে আর্দ্র জাল। সে কিছুক্ষণ যুবক-যুবতীর হাবভাব লক্ষ্য করিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'ভব, কি করিতেছিস?' যুবতী চমকিত হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল এবং কহিল, 'তোর কি চোখ নাই, আমি কি করিতেছি দেখিতে পাইতেছিস না?' নবাগত দৃঢ়মুষ্টিতে বর্শা ধারণ করিয়া কহিল, 'ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।'...নবাগত কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল, যুবতী তাহা দেখিয়া তাঁহাকে দাকিয়া বলিল, 'নবীন, ও নবীন, ওদিকে কেন যাচ্ছিস?'...প্রথম যুবক তখনও সেইখানে বসিয়াছিল, সে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভব, নবীন চলিয়া গেল কেন?' 'সে রাগ করিয়াছে?' 'রাগ কি?' ভব হাসিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। যুবক অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।"[২৭]

রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিরতির (Pause) প্রয়োগ সর্ব্বোচ্চ। যদিও যেকোনো উপন্যাসেই এই পরিচিত উপাদান লেখকেরা প্রয়োগ করেন বাচনে, কখনো স্থানিক পরিচয়, কখনো নতুন চরিত্রায়ণের সংস্থানে। 'বিরতি' হল অনুক্তির বিপরীত ধারণা বা 'text without story duration'–Toolan–এর মতে। অর্থাৎ মূলকাহিনি বহির্ভূত কাহিনির দূরত্ব। সেক্ষেত্রে বাচনে কাহিনির সময় থাকে নিশ্চল বা স্থির। যেহেতু, সাধারণত কথা আখ্যানের সূচনায় এই বিরতি ব্যবহৃত হয় কোনো ঘটনা, চরিত্র বা স্থানের বর্ণনায়, এক্ষেত্রে তাই বর্ণনামূলক যতি বা descriptive pause লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত এই বিরতি দুইভাবে লেখক তাঁর আখ্যান বাচনে ব্যবহার করেন। কখনো তা 'গতিশীল' কখনো তা 'স্থিতিশীল' অবস্থায়। গতিশীল বিরতি অনেকসময়য় স্থানিক পরিচয় প্রদানে; আর স্থিতিশীল বিরতি চরিত্র প্রকাশক রূপে ব্যবহৃত হয়। রাখালদাসের উপন্যাসের সময়বিন্যাসে এই দুই বিরতির উদাহরণ পাই।

স্থানিক বিরতি (গতিশীল)

"উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সভামণ্ডপের ন্যায় সমুদ্র-গৃহ। সমুদ্রগুপ্ত নির্ম্মিত সভাকুট্টিমের এক পার্শ্বে শুভ মর্ম্মর নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ বেদী। তাহার উপরে সুবর্ণ নির্ম্মিত মণিমুক্তাখচিত বৃহৎ সিংহাসন। বেদীর নিম্নে অসংখ্য চন্দন এবং বহুমূল্য কাষ্ঠনির্ম্মিত, হস্তিদন্তখচিত সুখাসন। বিশাল সভামণ্ডপ প্রায় জনশূন্য। চারিদিকে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। প্রতি দ্বারের বাহিরে সশস্ত্র প্রতিহার ও ভিতরে মূক বধির অন্তঃপাল।... গৃহটি অতি ক্ষুদ্র এবং তাহার চারিদিকে চারটি দুয়ার। কক্ষের চারিদিকে একটি প্রশস্ত অলিন্দ এবং তাহার চারিদিকে চারটি দীর্ঘ কক্ষ। বিশেষ গোপনে মন্ত্রনা করিবার জন্য বৃদ্ধ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এই মন্ত্রণাগৃহ করাইয়াছিলেন। অলিন্দের বাহিরে চারিটি কক্ষে অসংখ্য সশস্ত্র রক্ষী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।"[২৮]

চরিত্রায়ণ বিরতি (স্থিতিশীল)

"কর্নালের যুদ্ধের মোঘল সম্রাট মহম্মদ শাহের পরাজয়ের প্রধান কারণ নূর বাঈ। নূর বাঈ তন্বী, অপরূপ সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী। লকে বলিত যে তাহার বর্ণ গোলাপের মত। তাহার সুক্ষ চর্ম্মের ভিতর হইতে যৌবন-চঞ্চল রক্তধারা স্পষ্ট প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। তাহার কণ্ঠে সৃষ্টিকর্ত্তা সুধা ও মাদিরার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিবেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সুন্দরী যুবতী নূর বাঈ সুগায়িকা। সে তাহার নৃত্য ও গীতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রনে বাদশাহ মহম্মদ শাহ হইতে দিল্লীর রাজপথের ভিখারী পর্য্যন্ত সকল্কে সমান ভাবে তাহার গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল।"[২৯]

মিশ্রবিরতি (স্থিতিশীল + গতিশীল)

আবার এই দুই বিরতি কখনো কখনো মিশ্রভাবে বাচনে ব্যক্ত হয়। অর্থাৎ, স্থান ও চরিত্রের বিবরণের আন্তঃর্ঘাতে বাচনে মিশ্রবিরতি গড়ে ওঠে। রাখালদাসের '**শশাঙ্ক**' উপন্যাসে 'ধীবর গৃহ' পরিচ্ছেদে এমনই মিশ্রবিরতির ব্যবহার করেছেন রাখালদাস। যেখানে স্থানের সাথে সাথে চরিত্রের পরিচয় মাত্রায়ণ ঘটে গেছে মিশ্রবিরতির সংস্থানে। যেমন-

"শীতলাতীরে আম্র-পনসের ঘন ছায়ায় একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের গোময়লিপ্ত পরিস্কার অঙ্গনে বসিয়া একটি অসিতাঙ্গী যুবতী ক্ষিপ্রহস্তে জাল বুনিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া একজন গৌরবর্ণ যুবক বিস্মিত হইয়া তাহার কলাকুশলতা লক্ষ্য করিতেছে। কুটীরখানি দেখিলেই বোধ হয় যে, উহা মৎস্যজীবর গৃহ। চারিদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ জাল, কুটীরদ্বারে একরাশি শুষ্ক মৎস্য এবং নদীতীরে শুভ্র বালুকাসৈকতে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র নৌকা পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে আর মনুষ্যের আবাস নাই। চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশি ও স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ কুঞ্জ। যুবতী অসিতাঙ্গী বটে, কিন্তু তথাপি সুন্দরী, তাহার সুগঠিত অবয়বগুলি দেখিলে বোধ হয়, কোন নিপুণ শিল্পী কৃষ্ণমর্ম্মর প্রস্তর খুদিয়া তাঁহাকে গরিয়া তুলিয়াছে। যুবতী গ্রীবা বাঁকাইয়া মনোহর ভঙ্গী করিয়া দুইহাতে জাল বুনিতেছিল, এবং এক একবার ঈষৎ হাস্য করিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার সঙ্গীর দিকে চাহিতেছিল। সে দৃষ্টির অর্থ আর কিছুই হইতে পারে না, তাহার অর্থ – অসহ্য তৃষ্ণা, অদম্য আকাঙ্খা এবং হৃদয়ের নিদারুণ অব্যক্ত যন্ত্রণা। সঙ্গী তরুণ যুবক, বয়ক্রম বিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু তাহার রূপ অপরূপ। তেমন রূপ কখনও ধীবর কৈবর্ত্তের গৃহে দেখা যায় না। তরুণ তপনতাপে বিকশিত তামরসের অন্তরাভার ন্যায় তাহার বর্ণ অনির্বচনীয়, মলিনবসনে ধূলিশয্যায় তাঁহাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় দেখাঁইতেছিল।"[৩০]

৪

আখ্যান বাচনে সময় বিন্যাসের শেষ এবং অন্যতম উপাদান বা চলন হল পৌনঃপুনিকতা বা frequency। আখ্যানবিশ্বে এই ধারণাটির ভিত্তিভূমি হল কাহিনির ঘটনা ও তার বাচনে উপস্থাপনের অনুপাত। অমিতাভ দাসের মতে,-

> "কোন বাচনে একটি কাহিনি কতবার বলা হবে অথবা বহুবার ঘটা একই কাহিনি কতবার বলা হবে, তারই কৌশল হল পৌনঃপুনিকতা।"[৩১]

অর্থাৎ, বাচনে একক কাহিনির পুনরাবৃত্তিকেই আমরা তার পৌনঃপুনিকতা হিসাবে ধরে নিতে পারি। রাখালদাস তাঁর উপন্যাসের সময় বিন্যাসে এই উপাদানের প্রয়োগ করেছেন 'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাসে। সেখানে একটি কাহিনির পুনরাবৃত্তি করে মূল কাহিনির গতিপথ তিনি তরান্বিত করেছেন। সেক্ষেত্রে এখানে পুনারাবৃত্তি কাহিনিটি মূলকাহিনির পশ্চাৎপটরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবার 'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'নাদির শাহ' অংশে একটি ঘটনার পৌনঃপুনিকতা দেখানোর চেষ্টা করা যায় এভাবে, -

মূলকাহিনি ⬇	পৌনঃপুনিক কাহিনি ⬇
মোঘলের অধঃপতনের যুগ বর্ণিত। সাল ১৭৩৮। নাদির শাহের দ্বারা দিল্লীবাসী অত্যাচারিত।	তখনও নূর বাঈ অতি সুন্দর নাচিতেছিল। কোকিজীউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিলেন।

অর্থাৎ, মূল কাহিনির সঙ্গে এই কাহিনির পুনরাবৃত্তির (frequency) কারণ একটাই হতে পারে, মোঘল সম্রাটের অসাবধানতা। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাই সেই কাহিনিরই পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে উপন্যাসে।

সেখানে বর্ণিত ঔরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যুর বত্রিশ বছর পরে দিল্লীর আফগান শাহ নাদির শাহ কর্তৃক যে মর্মান্তিক অবস্থা সত্ত্বেও মোঘল সম্রাটের কুড়েমি, বা রাজ্য সম্পর্কে অসচেতনতা বোঝাতে এই ধরণের পৌনঃপুনিকতার অবতারণা করেন রাখালদাস, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, 'লাচ্ছেদার রাবড়ি' অংশেও।

মূল কাহিনি ⬇	*পৌনঃপুনিক কাহিনি* ⬇
১৭৩৮ সাল। দিল্লীতে মোঘল রাজ্যে অন্নাভাব। নাদির শাহ দ্বারা দিল্লী অধিকারের পূর্ব মূহুর্ত।	*তখনও নূর বাঈ নাচিত। মৌলাব খান খেয়াল গাহিত। প্রাসাদে নিত্য প্রভাতে দরবার ও সান্ধ্যকালে মজলিস বসিত।*

শেষের কথা –

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নিরিখে বাচনস্তর সম্পর্কিত আলোচনায় কাল নির্ধারণে 'সময়ের পুনর্বিন্যাস' বা বাচনে 'ইতিহাসের পুনঃনির্মাণ' কীভাবে প্রকাশলাভ করেছে তার আলোচনায় উক্ত প্রবন্ধে এতক্ষণ ধরে করা হল। উপন্যাসের সংগঠন যেহেতু, লেখকের বাচনকৌশলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সেক্ষেত্রে লেখকের গদ্যগত শৈলি বিভাজন উপন্যাসের বাচনস্তরে প্রকাশ পায়। তখন তাঁর রচিত আখ্যান (উপন্যাস) হয়ে ওঠে শৈলী বনাম সংগঠনের আন্তঃর্ঘাতে বাচনে পুনর্বিন্যাস বা পুনঃনির্মিত কাহিনির স্বতঃপ্রকাশ। রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির বিচারে তাই বাচনস্তরের একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী উপাদান 'সময়' বিন্যাসের আলোচনা ক'রে বা ধারণা নিয়ে, উক্ত প্রবন্ধে দেখাতে চাওয়া হয়েছে, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরতে পরতে কাহিনিকাল কীভাবে লেখকের নিরীক্ষণে (focalization) পুনঃনির্মিত ইতিহাস হয়ে উঠছে উপন্যাসের বাচনস্তরে (discourse stage)।

তথ্যসূত্র :

১. Genette, 1983, pp. 29
২. Rimmon kenon, 2005, pp. 47
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়ূখ, পৃ. ০১
৪. তদেব, পৃ. ৫৫৬
৫. দাস, আখ্যানতত্ত্ব, পৃ. ৪৫
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, পাষাণের কথা, পৃ. ৫১
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমকণা, প্রবাসী, ১৩১৯, পৃ. ২৩৬
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়ূখ, পৃ. ৫০৯
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, লুৎফ-উল্লা, পৃ. ৪১
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবা, পৃ. ১৩১
১১. তদেব, পৃ. ০১
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক, পৃ. ১৭১
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা, পৃ. ৩২৮
১৪. দাস, আখ্যানতত্ত্ব, পৃ. ৪৫
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক, পৃ. ১১৩
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক, পৃ. ১৬৪
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক, পৃ. ৯৫-৯৬
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, লুৎফ-উল্লা, পৃ. ৪১
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মপাল, পৃ. ২৭২
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, লুৎফ-উল্লা, পৃ. ২৬
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মপাল, পৃ. ২৮৯
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক, পৃ. ২০২
২৩. Rimmon kenon, 2005, pp. 56
২৪. চন্দ্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৪
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক, পৃ. ৬১
২৬. তদেব, পৃ. ১৭৮
২৭. তদেব, পৃ. ১৭৭
২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবা, পৃ. ১২
২৯. তদেব, পৃ. ১৭৬
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক, পৃ. ১৭৬
৩১. দাস, আখ্যানতত্ত্ব, পৃ. ৪৭

গ্রন্থপঞ্জি :

১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ২০১৫
২. চক্রবর্তী, অলোক্ আখ্যানের তত্ত্বভুবন, কলকাতা : আশাদীপ, ২০২১
৩. চৌধুরী, কমল, সম্পাদিত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস চিন্তা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫
৪. দত্ত, বিজিত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ

৫. দাস, আমিতাভ, আখ্যানতত্ত্ব। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯
৬. আখ্যানতত্ত্বের সীমা, আমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সম্পাদিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০০৯ ,
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৩/বি
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, ধ্রুবা, কলকাতা, মর্ডান কলাম, ১৯৬৩
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, লুৎফ-উল্লা, কলকাতা, মর্ডান কলাম, ১৯৭০
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, পাষাণের কথা, কলকাতা, মর্ডান কলাম, ১৯৬৭
১২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কলকাতা, জেনারেল, ২০১৪
১৩. সুর, অতুল, আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙ্গালী, কলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০১৬
১৪. Carr, David. Time, Narrative and History. Indiana University Press. Bloomington/ Indianapolis. 1991
১৫. Dijk, Tenna Van (Ed). Discourse and Literature, John Benjamins Publishing company. Amsterdam/Philadelphila. 1995
১৬. Fowler, R(ed), Style and Structure in Literature. Oxford, Basil Blackwell. 1975
১৭. Genett, Gerard. Narrative Discourse : An Essay in Method. Cornell University Press. Ithaca & New York. 1983
১৮. Genett, Gerard. Narrative Discourse : Revisited. Cornell University Press. Ithaca & New York. 1988
১৯. Lukacs, Georg. The Historical Novel. Trans, Hannah and Stanley Mitchell. Penguin Books. 1969
২০. Todorov, Tzvetan. The place of Style in the Structure of the Text. In S. chatman (ed) Literary Style : A Symposium. London & New York. Oxford University Press. 1971